

দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষিতে আলোচ্য তিনটি কাব্যের উদ্ভব এবং তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী সময়কালে লক্ষ্য করা যায় আকবরর মৃত্যু থেকে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু এই সময় কালে বাংলার ভাগ্যাকাশে অনেক তারকার উদয় এবং অস্ত গেছে। ঐ সময়কার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি নদীর গতির ন্যায় ঝাড়ু ছিল। আমীর ওমরাহদের তৎপরতা, ক্ষমতার লোভ, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি, মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্ষয়ের পথ পরিস্কার করে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক অধঃপতন বড় আকার ধারণ করে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় “সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কে মোটামুটি স্বাভাবিক হলেও মাঝে মাঝে ধর্মাস্তরীকরণের ধাক্কা যে হিন্দু সমাজকে বিচলিত করত তাতে সন্দেহ নেই। পীর ফকির দরবেশের উৎপাত তো ছিলই, তার সঙ্গে কখনও কখনও রাষ্ট্র শক্তি হাত মেলাতো।”^{১১} হিন্দু সমাজে চর্চা স্বরূপ দেখাদিল বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক সহজিয়া সম্প্রদায়। সমাজের নিম্নস্তরের নাথ ধর্মের প্রসার ঘটে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা এবং বৈষ্ণব সাহিত্যাদি অনুশীলনের ব্যবস্থা হল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসা মঙ্গলকাব্য রচনার আত্ম প্রকাশ করে বাইশকবি-দ্বিজ বংশীদাস, কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজীবন ঘোষাল প্রমুখ কবিরা। ঐ সময় কালে চণ্ডীমঙ্গল এবং দুর্গামঙ্গল কাব্য রচিত হতে থাকে। দ্বিজরামদেব ভবানীপ্রসাদ রায় কৃষ্ণরাম দাস প্রমুখ কবিরা কাব্য রচনায় দক্ষতার পরিচয় এর পাশাপাশি তাদের আধ্যাত্মানুভূতি আত্মপ্রকাশ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য কৃষ্ণরাম দাস। কৃষ্ণরাম দাস মধ্যম শ্রেণীর কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাঁচটি মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। ক) কালিকা মঙ্গল খ) রায় মঙ্গল গ) ষষ্ঠী মঙ্গল ঘ) শীতলা মঙ্গল ঙ) কমলা মঙ্গল। যদিও বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক গণেরা এই মঙ্গল কাব্যকে অ-প্রধান মঙ্গলকাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। কৃষ্ণরাম পরবর্তী কবি নিত্যানন্দ ‘শীতলা মঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। নিত্যানন্দ চত্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ বলিয়া

মনে করেন, নিত্যানন্দের সময় কাল চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন-“রাজনারায়ণের সভায় ১৬৯৯ শকাব্দে বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের’ অন্তর্গত ‘গণেশ খন্ড’ এবং ১৭০৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’ অনুলিখিত হইয়া ছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এই সময়েই বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দের ভাষা সুমার্জিত এবং একটু আধুনিকতার পরিচায়ক। ভাষা দেখিয়া তাহাকে অন্তত সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বকার লোক বলিয়া কিছুতে মনে হয় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।”^{১২} সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গল কাব্যের কবিরা অ-প্রধান কবি হিসাবে মঙ্গল কাব্য ধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। ওদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে স্থান কাল এবং সমসাময়িক অবস্থার পরিবেশ পরিস্থিতি কাব্যমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে যে রাজনৈতিক উত্থান পতন মুঘল সাম্রাজ্যে বিদ্যমান ছিল-যার প্রভাব অন্নদামঙ্গল সহ অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে পড়েছে। কবি সাহিত্যিকরা সমাজের মানুষ সমাজের ভাষা সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের লেখনিতে থাকতে এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তাদের অনুভূতির জগৎ হল বাস্তব। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আবর্ত যা অবশ্য সমকালের লেখনীতে ছাপ পড়বে। সাধারণ মানুষ শেষ করে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজন অনেক বেশী দৈব আশ্রয়ী। ১৭০০-১৭৬১ সময় কালে ঘটে গেছে বিভিন্ন ঘটনা মোঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়, নবাবী আমলের বেহাল অবস্থা, বর্গীর আক্রমণ আর অপর দিকে জমিদারী ব্যবস্থার অবক্ষয় এই অবস্থার সঙ্গে সে যুগের মানুষের পরিচয় খুবই স্বাভাবিক। মঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, যে নারী দেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম মঙ্গল, কাব্যে শিবায়ণ কাব্যে, রায়মঙ্গল কাব্যে এই কাব্যগুলিতে নারীর পরিবর্তে পুরুষ দেবতার বীরত্ব মহিমা, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কাব্যগুলিতে ধরা পড়েছে। প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলির মতই আজও পূজার্চনা চলছে। সমাজের মানুষের কাছে তাদের মহিমা অধ্যাত্মিক অনুভূতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। অপ্রধান মঙ্গলকাব্য- কালিকা মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, বসন্তীমঙ্গল, সারদা মঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, এবং তীর্থমঙ্গল, ইত্যাদি মঙ্গল কাব্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ পূজার্চনা করে। এই সমস্ত কাব্যের দেবদেবীর নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকার সাথে জড়িত। তাদের জীবন ধারণ, জীবন সংগ্রাম পথ চলতি, যাই বলা যাক না কেন সাধারণ

মানুষ আজ একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে তাদের উপাস্য দেবদেবীরা আজও চর্চিত, বাংলার ঘরে আজও সমাদৃত।

মঙ্গলকাব্য ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা প্রবাহমান। প্রবাহিত ধারায় অন্তিম মুহূর্ত সেই ট্রাডিশান চলছে। কারণ এই দীর্ঘ প্রবাহিত ধারা অন্য সমস্ত ধারা থেকে ব্যতিক্রমী। ব্যতিক্রমী সবদিক থেকে আধ্যাত্মচর্চা, মানব মুক্তির পথ, কিংবা জীবন জীবিকার সাথে ভীষণ ভাবে জড়িত। এই দীর্ঘ মঙ্গলকাব্য ধারা মানুষের ভয়ভীতি পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিষয় গুলো মানুষের ভেতরকার অনুভূতি। মঙ্গলকাব্য ধারার অন্তিম পর্বে যে অপ্রধান কাব্যগুলি পাওয়া যায় তাদের “কাহিনী পরিকল্পনা ও কবিত্ব সৃষ্টির দিক দিয়া আর কোনও মঙ্গল কাব্যই তেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই।” * অ-প্রধান এই মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু- ‘রায়মঙ্গল’, ‘শীতলা মঙ্গল’, এবং ‘ষষ্ঠী মঙ্গল’ এই তিন কাব্যের প্রেক্ষাপট, ঘটনাবলী এবং সমাজ চেতনা এবং তাদের চর্চা ক্ষেত্র আমাদের অনুধাবন করা জরুরী। “ইহারা পূর্বোক্ত প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলির ব্যর্থ অনুসরণে পর্যবসিত হইয়াছে মাত্র।”^৪ এই বক্তব্যকে পাথেয় করে দেখা যায় কাব্যপরিচালনায় ভাষা অলংকার রচনার দাঢ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি কখনই নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি। কারণ তাদের আঞ্চলিক ক্ষেত্র জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে এগুলিতে দৈব ভাবনা সজ্জাত। তাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সর্বোচ্চ স্তরে এই ‘রায়মঙ্গল’ ‘শীতলা মঙ্গল’ এবং ‘ষষ্ঠী মঙ্গল’ অবস্থান করছে। কোন দক্ষতা, কৃতিত্ব কাব্য গৌরব, গ্রহণ যোগ্যতা ইত্যাদি সমালোচনার তারা পক্ষপাতী নয়।

আমরা নিম্নে এই রায়মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল এবং ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্য গুলির উদ্ভব এবং তাদের আঞ্চলিক প্রেক্ষিত আমাদের কৌতুহলের বিষয় বস্তু। আমরা কাব্যগুলির উদ্ভব বিষয়টি আমাদের পূর্বে প্রধান মঙ্গল কাব্য গুলির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি। দেবদেবীদের প্রচার প্রসার বিষয়ে তাদের ভয়ভীতি ক্ষমতা এবং সংগ্রাম বিক্রম কাব্যগুলির সাধারণ জন জীবনে সাড়া ফেলেছে। মনসা, চন্ডী, ধর্ম দেবতা এরা সবাই কৌশলে জোরপূর্বক পূজা আদায় করেছে। এদের আঞ্চলিক এই পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ করে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আজো পূজার্চনা করে চলেছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কম বেশী এই দেবদেবীর আশ্রয় পেয়েছে। অপ্রধান মঙ্গল কাব্যগুলি উদ্ভব বিষয় আমরা মূল কাব্য চর্চায় উঠে আসবে। অনেক সময় স্বভাব কবি, ভক্তকবি তাঁরা স্বতোপ্রনোদিত হয়েও কাব্য রচনা করেছে।

কৃষ্ণরাম দাস বাংলা মঙ্গল কাব্যের একমাত্র কবি যিনি পাঁচটি মঙ্গলকাব্য রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সমস্ত মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁর রচিত কালিকা মঙ্গল, রায়মঙ্গল, যষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলা মঙ্গল আমাদের আলোচ্য রায়মঙ্গলের উদ্ভব অনুসন্ধানে “একমাত্র কালিকা মঙ্গল ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের তাঁহার পূর্ববর্তী কোন রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায় না।”^৬ কিন্তু রায়মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে দেখা গেল গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ। অংশে কবি কৃষ্ণরাম দাস বলেন-

“পূর্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।

না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্যে ॥”^৭

উপরোক্ত চরণ দ্বয় থেকে জানতে পারলাম কৃষ্ণরাম দাসের পূর্ববর্তী কবি মাধব আচার্য্য। কিন্তু কবির রচিত রায়মঙ্গলের কোন সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। রায়মঙ্গল কাব্যের আরও দুইজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা হলেন রুদ্রদেব এবং হরিদেব এদের কাব্য ছিল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। কিন্তু দুঃখের বিষয় রুদ্রদেব এবং হরিদেব কবিদ্বয়ের কোন কাব্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

রায়মঙ্গল গ্রন্থের উদ্ভব অনুসন্ধানে জানতে পারা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা মেদিনীপুর, আসাম এবং বাংলাদেশের উপকূলবর্তী বেশ কিছু অঞ্চলে রায়মঙ্গল ঘটনার সাথে মিল আছে এমন একটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। মোহাম্মাদ খাতের সাহেব প্রণীত ‘বোনবিবি জহুরা নামা’। গ্রন্থটির খাতের সাহেব প্রণীত গ্রন্থের ঘটনা, চরিত্র, পটভূমিকা কোন কিছুর সাথে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গলের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি গ্রন্থের ভাষা-হৃদ-অলংকার ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ খাতের সাহেব প্রণীত গ্রন্থের সাথে রায়মঙ্গল গ্রন্থের কোন সাদৃশ্য নেই। আমরা কৃষ্ণরাম দাসের রচনা রায়মঙ্গল কাব্যটির উদ্ভব বিশেষত্ব এখন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে জানা গেল তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কবি রায়মঙ্গল কাব্য রচনা করেন ঠিকই, তাঁরা হলেন মাধব আচার্য্য এবং রুদ্রদেব। তবে তাদের রচিত কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রায়মঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ কবি হিসাবে কৃষ্ণরাম দাসের দাবী সর্বঅগ্রগণ্য।

ব্যাসদেবতার উদ্ভব সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। “ভারতীয় প্রাগায় সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যাসের পূজা প্রচলিত ছিল। মহেঞ্জোদারোতে সে প্রাচীন শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়। তাহার পাশেই ব্যাসের আকৃতি কতকগুলি মূর্তি পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন

অনার্য সমাজের দেবতা শিব বাঘেশ্বর কৃত্তিবাস এবং ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার আসন।”^৭ অর্থাৎ ব্যাঘ্রদেবতা ব্যাঘ্রচর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলো তুলনা মূলক প্রাচীন। প্রাচীন কালের ব্যাঘ্রোপাখনা পরবর্তীকালে শৈবধর্মে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উত্তর ভারতে ব্যাঘ্রপূজা বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, এমন বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য রাজপুতনায় ‘বাঘের রাজপুত’ বলিয়া একটি বিশেষ সম্প্রদায় আছে। তারা ব্যাঘ্রপালক সম্প্রদায়ের বংশধর। যদিও মধ্যভারতে ব্যাঘ্রোপাসিক সম্প্রদায় আছে। তাহারা ব্যাঘ্রের পূজা করে, কিন্তু বাঘের শিকার করে না। অনেক সময় সাহেবরা বাঘ শিকার করার জন্য গভীর বনের মধ্যে ফাঁদ তৈরী করে থাকে। সে ক্ষেত্রে এই ব্যাঘ্রোপাসিক সম্প্রদায় বনের মধ্যে গিয়ে বলে আসেন এই ফাঁদ তারা নির্মাণ করেনি। অর্থাৎ তাহাদের কোন অপরাধ বা দোষ নাই। এমনকি তারা দাবি করে থাকে অনেক সময় রাজপুতনার ভীলেরা নিজেদের ব্যাঘ্রবংশজ বলিয়া মনে করে। নেপালে বাঘ যাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ ইহাও এক প্রকার বাঘের পূজা, বাঘের মুখোশ পরিয়া পূজারীরা নৃত্য করিয়া থাকে। নেপালে বাঘের দেবতার নাম ‘বাঘভৈরব’। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলের বাঘেশ্বর নামে এক দেবতা নিম্নশ্রেণীর সমাজে পূজা পেয়ে থাকে। ছোটনাগপুরের সাঁওতালদিগের মধ্যেও ব্যাঘ্রের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারের কোন কোন স্থানে বনের রাজা হিসাবে বাঘের পূজার্নার প্রচলন আছে। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই বাঘের পূজা প্রচলন আছে। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট অঞ্চলে বাঘের পূজা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ ব্যাঘ্র দেবতার উদ্ভব বিষয়টি বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাক্ষান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল সংলগ্ন এলাকার নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় আদিবাসী সম্প্রদায় বহু প্রাচীন কাল থেকে এই পূজার প্রচলন আছে বলে বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা দাবী করে থাকেন।

আমাদের গবেষণায় রায়মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব প্রেক্ষিতটি অনুসন্ধানের জন্য আমরা শ্রদ্ধেয় কবি কৃষ্ণরাম দাসের বিশেষ পুঁথি ‘রায়মঙ্গল’কাব্যটি আলোচনায় কবি যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখিত। মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধারার অনুসরণ রায়মঙ্গলকাব্যের দ্বিতীয় কবিতার শুরুতেই কবি যে স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে উল্লেখিত হল।

“শুনহ সকলধীর অপূর্ব কথন ।

যেমতে রটিল এই কবিতা রচন ॥

খাসপুর পরগণা নামে মনোহর ।

বড়িয়া তাহার কে তপা বিশ্বস্তব ॥

তথ্যে গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে ।

নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে ॥

রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন ।

বাঘ পৃষ্ঠে আরোহন এক মহাজন ॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায় ।

পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥

পাচালি প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার ।

আঠারোভাটীর মাঝে হইব প্রচার ॥

পূর্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য ।

না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য ॥

মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা ।

চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ॥

মোরগীত না জানিয়া থতেক গায়ন ।

অন্যগীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ ॥

ফাকুটীনাফুটী আর করে রঙ্গীভঙ্গী ।

পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী ॥”৮

কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য উৎপত্তির বিষয়টি কবি তাঁর কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করলেন। এবং স্বপ্ন দর্শনে দক্ষিণরায় কবিকে নির্দেশ দিলেন। বলা বাহুল্য মঙ্গল কাব্যের ধারা বাহ্যিক ট্রাডিশন এটি ভগবান দক্ষিণ রায় কবিকে স্মরণ করিয়ে ছিলেন। মাধব আচার্য রচিত গীত তাহার পছন্দ নয়। অর্থাৎ তার রচনাকে আরো অনেক বেশী উন্নত কাব্যগুণ সম্পন্ন হওয়ার প্রতি দক্ষিণরায় জোর দিয়েছে।

রায়মঙ্গল কাব্য রচনায় কবি কৃষ্ণরামকে স্বপ্ন দর্শনের পাশাপাশি কাব্য রচনা এক প্রকার ক্ষমতা প্রদান করলেন। দক্ষিণ রায় কবি কৃষ্ণরামের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন বলে গবেষক হিসাবে মনে করি। দক্ষিণ রায়ের প্রত্যাশা কৃষ্ণরাম বিরচিত রায়মঙ্গল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও কাব্যগুণ সম্পন্ন

হবে এই আশা করে তিনি এ কথা বলতে পারেন।

“তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে,

সর্বংশে তাহারে তবে সংহারিয়ে বাঘে।”^{১৯}

দক্ষিণরায় একপ্রকার ক্ষমতা কবি কৃষ্ণরামকে দিয়ে গেলেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যত মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে -এ ধরনের দৈব নির্দেশ সম্পূর্ণ বিরল।

রায়মঙ্গলকাব্যে দক্ষিণরায় কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যের সমাদর এবং এই কাব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না দিলে তাকে বাঘ দিয়া খাওয়ানোর নির্দেশ দেন। কবি কৃষ্ণরাম দাস মধ্যম শ্রেণীর কবি হওয়া সত্ত্বেও এমন কি তার পারদর্শিতা দক্ষতা দক্ষিণরায় সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। কবি কৃষ্ণরাম নিজের অক্ষমতা কিংবা যদি কোন দোষ ত্রুটি হয় সে কারণে তিনি নিজেকে শিশু বলিয়া গীত রচনার যাবতীয় সমস্যা কে আগেই ব্যক্ত করলেন। যাই হোক কবি তাঁর কাব্য রচনার সময়কালকে গ্রন্থের মধ্যে ব্যক্ত করলেন।

“কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।

বসু শূন্য ধাতুচন্দ্র শকের বৎসর ॥”^{২০}

উপরোক্ত চরণদ্বয় থেকে রায়মঙ্গল কাব্যের সমকাল অত্যন্ত সুচারু রূপে কবি উপহার দিয়েছেন।

১৬০৮ শকাব্দ বা ১৬৮৬ খ্রীঃ কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল রচিত হয়েছে।

কৃষ্ণরাম দাস ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যের গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অংশে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য চরণে উদ্ভব বিশেষত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে। ব্রাহ্ম দেবতা বোনবিবি দক্ষিণরায় কালুরায় (কুন্তীর দেবতা) প্রভৃতি দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তন বিভিন্ন কবির রচনায় এবং অরন্যজীবী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের অনেক রচনা যা কিনা ব্রাহ্ম দেবতা বনবিবিকে পুষ্ট করে। মোহাম্মাদ খাতের সাহেব প্রণীত ‘বোনবিবি জহুরি নামা’ গ্রন্থটি আকর্ষণীয় এবং কৌতুহলদীপক কিন্তু গ্রন্থ উৎপত্তির কারণটি একমাত্র কবি কৃষ্ণরাম দাস গীতির পূর্ণতার পাশাপাশি গীত রচনার কারণ বর্ণনা করেছে। গ্রন্থটি কাব্যগুণ মাহাত্ম্য গুণ কবির আভিজাত্য থাকলেও কৃষ্ণরামের কাব্যের গুরুত্ব পাঠক সমালোচক গবেষক নির্দিষ্টায় স্বীকার করে। কিন্তু মোহাম্মাদ খাতের সাহেবের বনবিবি জহুরা নামা গ্রন্থটি যাত্রা অভিনয় শিল্পগুণ দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। তবে সমালোচক কিংবা গবেষণায় কেন্দ্র বিন্দুতে কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল

কাব্যটি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।

রায়মঙ্গল কাব্যের উদ্ভব বা উৎপত্তি কাব্য মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে কবি উল্লেখ করেন। কবির এই কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট বন্য-স্বাপদ সঙ্কুল বনাঞ্চল কেন্দ্রীক ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায়কে কেন্দ্র করে। কবি কলকাতার অদূরে নিমতা গ্রামের মানুষ, সংস্কৃত ও পুরাণ সাহিত্যে তার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। তার পাণ্ডিত্যের স্পর্শ, বাস্তব জীবনানুভূতি, কবিকে এই ধরনের কাব্যরচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখাতে সহায়তা করেছে। রায়মঙ্গল কাব্যের চরিত্র, বিষয় বস্তু, সামাজিক প্রেক্ষিত— এসবই সুন্দরবন কেন্দ্রীক ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এই দেবতার পূজার্চনা প্রান্তিক মানুষ অর্থাৎ নিম্নবিত্ত মানুষদের দ্বারা হয়ে চলেছে। সুন্দরবনের জেলে, বাগদী, মৌলে, মৌলিয়া এদের জীবন জীবিকা সুন্দরবন কেন্দ্রীক। সুন্দরবনের গভীর অরণ্য দল বেঁধে এরা মোম, মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। এমনকি মাছ, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া ভিন্ন কোন পেশা নেই। তাই তারা রায়মঙ্গল কাব্যের দেবতা দক্ষিণরায়কে পূজার্চনা সারা বৎসর ধরে চালিয়ে যায়।

কবির নিমতা গ্রাম তৎকালীন সময়ে গন্ডগ্রাম, এবং ঐসময় কালে সুন্দরবনের ব্যাপ্তি ছিল সুদূর প্রসারী। যে কারণে জেলে বাগদী মৌলে মৌলিয়া এদের কবি চাক্ষুস দেখেছে। তাদের আধ্যাত্ম চর্চা কবি অনুভব করেছে। অবশ্য ব্রাহ্ম পূজা ইতিহাস অনেক প্রাচীন। ব্রাহ্ম দেবতার আঞ্চলিক স্তর বিষয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন “এই ব্রাহ্মদেবতা অঞ্চল বিশেষে নানা নামে পরিচিত। হিন্দু প্রধান অঞ্চলের দেবতার নাম দক্ষিণরায়, মুসলমান প্রধান অঞ্চলের ব্রাহ্ম দেবতা বড় খাঁ গাজী নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও ব্রাহ্মদেবতাকে বলে সোনারায়-মুসলমান সমাজে ইনি পীর সোনারায় নামে পরিচিত।”^{১১} আঞ্চলিক প্রেক্ষিত এই কাব্যের মহিমাকে প্রসারিত করেছে। কাব্যের ব্যাপ্তিকে সুদূর প্রসারী হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

সুন্দরবনের আকার আয়তন বিষয়ে ভৌগলিক যে পরিমণ্ডলের পরিচয় দিয়েছে তা হল— “গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় প্রকৃতির নিয়মে গড়ে ওঠা বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ হল সুন্দরবন। যার আয়তন ২৫,৫০০ বর্গ কি মি ভারতের অংশের সুন্দরবনের আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিমি। বাংলাদেশের মধ্যে সুন্দরবনের অংশ হল ১৫৮৭০ বর্গ কিমি।”^{১২} বিশাল পরিমণ্ডলের সুন্দরবন, যাকে কেন্দ্র করে জেলে, বাগদী, মৌলে, মৌলিয়া, কাঠুরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক

জনজাতি—যাদের জীবনজীবিকা সবই সুন্দরবন নির্ভর। সুন্দরবনের একমাত্র বিপদের কারণ বাঘের আক্রমণ। বাঘের কোপের হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসাবে ‘বনবিবি পূজা’ একান্ত ভাবে জরুরী। রায়মঙ্গল কাব্যে এই নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন জীবিকা ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। যে কারণে আর্থিক প্রেক্ষিত অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ এই দুই বঙ্গে নদী মাত্রিক।

বন্য প্রজাতির জীব জন্তু-হরিণ, বাঘ, শেয়াল, বানর ইত্যাদি অবাদ বিচরণ ভূমি সুন্দরবন। ব্যাতিক্রমী বাঘ, যে কিনা হিংস্র। একমাত্র বাঘের হাত থেকে রক্ষার জন্য রক্ষয়াত্রি বনবিবি এবং দক্ষিণরায়ের পূজার্চনা করা হয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবনের অবস্থান বলে তাকে দক্ষিণ দেশ বলা হয়েছে। সুন্দরবনকে ভাটির দেশ বলা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় মুঘলযুগের বারভুঁইয়াদের নামে এখানে ‘বারভাটি’ নামে পরিচিত। রায়মঙ্গল কাব্য মধ্যে কবি কৃষ্ণরাম দাস বলেন—

“আমি দক্ষিণের রায় সর্বলোকে গুণ গায়

আঠারোভাটিতে পূজে ঘরে।”^{১৩}

সুন্দরবন বাদাবন অঞ্চলের ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে বলা যায় “জব চার্নকের কলকাতা আসার সময় কলকাতা ছিল বাদাবন সংলগ্ন একটি গ্রাম। কলকাতার দক্ষিণে কিলোমিটার দশেকের মধ্যে বাদাবন ছিল ১৭৬৫ সালেও। এরপর দ্রুত জঙ্গল কেটে আবাদ তৈরী হওয়ায় ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের অন্তর্গত সুন্দরবনের ১০৪টি দ্বীপের ৫২টিতে তৈরী জনবসতী। বর্তমানে এ বঙ্গে বাদাবনের আয়তন ৪২৬৪ বর্গ কিলোমিটার। যার প্রায় ৪০% হল জলাশয়। বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের বাদাবনের মোট আয়তন ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। যার মধ্যে বনভূমি ৪১৪৩ বর্গকিলোমিটার, বাকিটা জল।”^{১৪} এই দ্বীপ এলাকা অর্থাৎ স্থল ভাগের মানুষের একটি বৃহৎ অংশের জীবিকা সুন্দরবন নির্ভর হওয়ার কারণে তারা বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একান্তভাবে বনবিবি দেবীর রায়মঙ্গলের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ কোথাও গানের মাধ্যমে আবার কোথাও বা যাত্রাভিনয়ের দ্বারা সবাই আনন্দ উপভোগ করে থাকে। রায়মঙ্গল কাব্যে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা উত্তর ২৪ পরগণা নদী মাত্রিক এলাকা মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, এছাড়া বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা ইত্যাদি স্থানের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুন্দরবন নির্ভর জীবন জীবিকা। সে কারণে তাদের রায়মঙ্গল কাব্যপাঠ এবং বাংলাদেশ অংশে বড় খাঁ গাজীর প্রতি তারা পূজা

দিয়ে থাকে। আবার হিন্দু প্রধান অঞ্চলে তারা দক্ষিণ রায়ের প্রতি পূজা নিবেদন করে।

সুন্দবনের আকর্ষণ চিরকালিন, বিশেষ করে দেশী, বিদেশী পর্যটকেরা তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্রে হিসাবে সুন্দরবনকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানুষ জনের বিচরণ ভূমি হিসাবে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মধু, মোম সংগ্রহের জন্য তাদের আগ্রহ বেশী। মধু, মোম সংগ্রহ করতে গিয়ে বণিকরা অনেক সময় বাঘের কবলে পড়ে যায়। বনাঞ্চল ধ্বংস করে নগরায়ণ যত বেশী পরিমাণে হচ্ছে তাতে করে বাঘের উৎপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা বাহুল্য বনাঞ্চলের নিকটবর্তী গ্রাম গুলিতে বাঘের প্রকোপ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। “খুব সম্ভবত ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী ইহতে এই কারণে দক্ষিণবঙ্গের ব্রাহ্ম দেবতার পূজার অত্যন্ত বেশী প্রচলন আরম্ভ হয়।”^{১৫} এক সময় অরন্য বেসিতিত এলাকাগুলিতে বিশেষকরে সুন্দরবন সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে পূজার্চনা হত। ব্যাঘ্র দেবতার পূজা পরবর্তী কালে হলেও পূর্বেই মুকুন্দ রামের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাঘ্রের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মা চণ্ডীর পূজা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঘ্র কালকেতু ও চণ্ডী পূজার মধ্যদিয়ে মুক্তি পেয়েছে। অর্থাৎ পশু সমাজে পূজার যে প্রচলন তা বহু পূর্বেই ছিল।

ব্যাঘ্রদেবতা কেন্দ্রিক পূজার্চনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তার দৃষ্টান্ত আছে। ব্যাঘ্র দেবতার পূজা এবং তার মূর্তি পূজা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। “বাংলার লোকে বাঘের পূজা করে না। এখানে বাঘ ও বাঘের দেবতা পৃথক। ব্যাঘ্র দেবতার মূর্তি প্রায়ই মনুষ্য-রূপী। পশুজগতের উপর মানব সমাজের প্রাধান্যই ইহা সূচক বলিয়া মনে হয়। মধ্য ভারত, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা বাঘের পূজা করিয়া থাকে।”^{১৬} বাঘের দেবতা একটি বিশেষ দেবতা মাত্র। জাতি বা গোষ্ঠীর অভিজান হিসাবে ইহার প্রচলন নাই।

দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্র দেবতার প্রচলন অনেক বেশি। ব্যাঘ্র দেবতা তিন ধরনের হয়ে থাকে— হিন্দুদের কাছে দক্ষিণ বায়, মুসলমানদের কাছে বড় খাঁ গাজি এবং উত্তর বঙ্গে এর নাম সোনারায়। এই তিন নামের একই দেবতার পূজার্চনা বঙ্গদেশে চলে আসছে। এই তিন প্রকার নাম থাকার সত্ত্বেও, এদের আকার আকৃতি রকম সকম ভিন্ন ভিন্ন। রায়মঙ্গল কাব্যের দেবতা অসম্প্রদায়িক। যে কারনে হিন্দু মুসলমান সবাই এই মূর্তির প্রতি পূজার্চনা ও তাদের নিবেদন জ্ঞাপন করে আসছে দীর্ঘদিন। অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ‘রায়মঙ্গল’ যে কারনে আমাদের কাছে অপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও তার দাবী শাস্বত কালীন।

আঞ্চলিক প্রেক্ষিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বনবিবির পূজা বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্বমেদিনীপুর, রবিশাল প্রভৃতি সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এই পূজা সুদূর অতীত কাল থেকে করে চলেছে। মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্রে এই মেলা, বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বনবিবি পূজা চলে আসছে। হিন্দু মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র হিসাবে এই দেবতাকে মান্য করে। মুসলমান সমাজ বড় খাঁ গাজী মসজিদ ঘুটিয়ারী শরীফে অত্যন্ত জাগ্জমক্ সহকারে দরগায় হাজত দেয়। আবার মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে পূজার্চনার পাশাপাশি যাত্রাঅভিনয় মাধ্যমে, পালা গানের মাধ্যমে দক্ষিণায় বনবিবির পূজার্চনা চলছে। আসামের প্রত্যন্ত এলাকায় নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ বনবিবির পূজার্চনা করে। বাঁকুড়া, বীরভূম -এর পূজাকে কেন্দ্র করে আনন্দ-উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষ দরগায় হাজতদেয়, মানত করে, মনস্কামনা পূরণের আশায় বিভিন্ন পশুপাখি বনবিবির উদ্দেশ্যে অর্পন করেন। ঘুটিয়ারী শরীফ, কুলতলি, ক্যানিং ইত্যাদি স্থানে বৎসরের ফাগুন, চৈত্র মাসে এই পূজার্চনা ঘটাকরে হয়।

সুন্দরবন সংলগ্ন নিকটবর্তী গ্রামবাসী শিকার বস্ত্রয়ালী, মধু সংগ্রহকারী মৌয়ালী প্রভৃতি মানুষ বাঘের সহিত যুদ্ধ করে, জীবন জীবিকা অর্জন করে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীরা বলেই থাকে 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' এই নিয়ে বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়- বিষাক্ত সাপ ও বিপদের কারণ। কিন্তু এসমস্ত বিপদকে তারা তেমন ভয় পায় না, কিন্তু বাঘের হিংস্রতা সুন্দরবন জীবী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মূল ভয়ের কারণ। সে কারণে তারা বনবিবি, দক্ষিণায়, বড় খাঁ গাজী সোনারায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে, ভিন্নভিন্ন স্থানে পূজার্চনা হয়ে চলেছে। বাংলাদেশের অন্তর্গত বাকের গঞ্জ, খুনলা সীমান্তে একদল মৌলে, মধু সংগ্রহের জন্য নিকটবর্তী অরণ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু একজন মৌলেকে বাঘ আক্রমণ করে এবং ক্ষতবিক্ষত করে। বাকিরা বাঁপিয়ে পড়লে তাদের মধ্যে বাঘ অপরজনকে পুনরায় আক্রমণ করে, শেষ পর্যন্ত মৌলেদের প্রতি আক্রমণে বাঘ পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরূপ ঘটনা ঘিঁষর, শিকারী, কাঠুরিয়া, মৌলে, মৌলিয়ারদের জীবনে প্রায় দেখা যায়। 'সুন্দরবনের ইতিহাস' গ্রন্থে এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল এর বইটিতে এমন আকর্ষণীয় ঘটনা আমাদের কৌতূহলকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয় পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের কাছে এ ঘটনা নতুন কিছু নয়।

ব্যাঘ্রদেবতার পূজা সুন্দরবন সংলগ্ন বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এই দুই বঙ্গের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে আদিবাসী-নমঃশুদ্র-পৌন্ড্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের দীর্ঘদিন তাদের পূজার্চনা করে চলেছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল সেখানে বহু প্রাচীনকাল থেকে ‘বাঘযাত্রা’ এবং বাঘের দেবতার পূজার্চনা প্রচলন আছে। নেপালিরা বাঘের মুখোশ পরে এই পূজার আনন্দ প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষজনের এই দেবতা নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও এদের মূল বিষয় বাঘকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত। বাঘের দেবতার নাম, অনুষ্ঠানের, এবং এই পূজাকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা অন্ত থাকে না।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নামে এই ব্যাঘ্র দেবতার পূজা প্রচলন আমাদের চোখে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলে ব্যাঘ্র দেবতার পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নশ্রেণীর মানুষ এই পূজার্চনা করে চলেছে। ছোটনাগপুরের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ বিশেষ করে সাঁওতাল দের মধ্যে এই পূজার প্রচলন আজোও আছে। অতীতে ছিল, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে, বিহারে বেশ কিছু স্থানে ব্যাঘ্র দেবতার পূজা ঘটাকরে হয়ে থাকে। এবং তারা ‘বনরাজা’ বলিয়া বাঘকে আলদা মর্যাদা দেয়। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদের কুর্কজাতি ‘বাঘদেও’ বলিয়া এক বাঘের দেবতার পূজা করে। মধ্যভারতের ব্যাঘ্র উপাসক সম্প্রদায় আছে, তারা বাঘের পূজার্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সাধারণ মানুষদের উৎসাহ উদ্দীপনা অন্ত থাকে না। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চলে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যাঘ্র দেবতার পূজা বিশেষ আনন্দ দেয়। তবে এগুলি বৎসরের কোন একটি নির্দিষ্ট সময় হয়ে থাকে।

কিন্তু সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে ব্যাঘ্রদেবতার পূজার্চনা ও বনবিবি দেবী কেন্দ্রীক গান যাত্রা বৎসরের যে কোনো সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে হয়ে থাকে। আর যে সমস্ত বাড়িগে, মৌলে, মৌলিয়ারা মানত করে— তাদের ক্ষেত্রে এই মানসিক পূজা বৎসরের যে কোন একটি সময় বাড়ীর মন্দির কিংবা বারোয়ারী মন্দিরে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আয়োজক তার ব্যক্তিগত খরচায় অনুষ্ঠান করে থাকে। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়— দক্ষিণ ২৪পরগণার- গোসবা, বাসন্তী, ক্যানিং ১ নং, ক্যানিং ২ নং, নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর ১নং, মথুরাপুর ২নং, জয়নগর ১নং, জয়নগর ২নং এই

সমস্ত ব্লকগুলিতে বারোয়ারী পূজা ব্যক্তিগত পূজা এবং বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক আনন্দ অনুষ্ঠান হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অত্যন্ত বেশী পরিমাণে চোখে পড়ে। যাই হোক রায়মঙ্গল কাব্যের দেবীর পূজার ব্যাপ্তি অসীম।

‘রায়মঙ্গল কাব্য’-এর আঞ্চলিক প্রেক্ষিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা ছাড়াও উঃ ২৪ পরগণা মনুষ্যবসতি দ্বীপ ১৬টি এই দ্বীপের প্রত্যেকটি অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ জীবিকার জন্য সুন্দরবন নির্ভর। উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁ, হাড়োয়া, সন্দেশখালী-১নং, সন্দেশখালী-২নং, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ-এলাকার “কাঠুরে-জেলে মৌলেদের প্রত্যেক দলে থাকে একজন করে দলনেতা বা বাউলে। বনবাদাড়ে বাউলদের কথা সকলের কাছে বেদবাক্য। এদের জীবনে ঘরে বাইরে সব অদ্ভুত নিয়ম কানুন। বাঘের মলুকে গিয়ে বাঘের কথা মুখে আনা মহাপাপ। যে ঘাড় মটকে রক্ত খায়, তাকে বলতে হয় বন্ধু। বাঘের সাড়া পেলে একে অপরকে সজাগ করে দিয়ে বলে বন্ধু এসেগেছে।”^{১৭} অরন্যজীবী মানুষদের অদ্ভুত নিয়ম কানুন “শুক্রবার বাদাবনে ঘাতাঘাত দূরের কথা, বাদাবনের মাটি ছোঁয়া বারণ। বাদাবনে যারা মল, মূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই।”^{১৮} সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জীবিকা অর্জন কবে, তাদের ক্ষেত্রে বহু নিয়ম শৃঙ্খলা এমন কি আধ্যাত্মিক অনেক গোপনীয় বিষয় থাকে।

সুন্দরবন অঞ্চলের বেশকিছু স্থান আছে, যেখানে কাঠুরিয়া, জেলে, মৌলে, মৌলিয়ারা অবাদে বিচরণ করে এবং বনের মধ্যে বনবিবি পূজা ঘটান করে থাকে। বনের মধ্যে তারা মেলা বসায়। শুধু তাই নয় তারা মানত করে তাদের মানসিক শোধও করে। অনেকে মুরগী ছেড়ে মানসিক করে মুরগীতে সুন্দর সিন্দুর পরিয়ে বনের মধ্যে ছেড়ে দেয়। পীরখালি, সজনেখালী, সুখন্যখালী, ফ্রেজারগঞ্জ, নেতিখোপানী, দোবাকী, হলদীবাড়ী ইত্যাদি স্থানে বনবিবিদেবীর পূজার্চনা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরা করে থাকে। প্রাসঙ্গিক ভাবে কালুরায় অর্থাৎ কুমীরের দেবতার পূজা ও চোখে পড়ে। সুন্দরবন এলাকার বেশকিছু বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী আজও অক্ষত-অলিভ কাঠা, বাটাপুরকাঠা, সামুদ্রিক কচ্ছপ, গোসাপ, ময়াল সাপ, এছাড়া বিরল প্রজাতির বেশকিছু পাখি-সারস, মদনটাক, শকুন, কাক, চড়ুই, কাস্তেচোরা, সামখোল, শালিক, বুকো সাদা মাছরাঙা পাখি ও বাটাং ইত্যাদি।

সমুদ্রতীরবর্তী মেদিনীপুর এলাকার সাধারণ মানুষ জনের অত্যন্ত যত্নসহকারে বনবিবি পূজার্চনা করে। যদিও কিছু নিয়মকানুন তারা পালন করে থাকে। বাদাবনে এলাকায় থাকার

সময় নখ, দাঁড়ি, গোঁফ কাটা বারন। স্নানের পর চিরঞ্জী ব্যবহার কিংবা ভিজা গামছা থাবা দিয়ে কাচাও বারন। মেদিনীপুরের-কসারিয়া, দিঘা, গেওখালি, শালবনী, বোয়ালতোড়, কলাইকুন্ডা, খড়্গপুর, হেড়ুয়া, দাদনপত্র, জুনপুট, মুকুন্দপুর, বুতুলপুর, মুকুন্দপুর, হিজলি, পিছাবনী ইত্যাদি স্থানে রায়মঙ্গল কাব্যের দেবী বনবিবি ভীষণ উদ্দীপনা ও উৎসাহ সহকারে মানুষ উপভোগ করে। এই এলাকার মানুষরা সুন্দরবনের মধু, মোম, কাঠ, মাছ এমনকি অনেক সময় হরিণ শিকার করত। সে কারনে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে মা বনবিবির কাছে তাদের আর্তি অত্যন্ত মার্জিত। এরা ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে বনের মধ্যে প্রবেশ করত। এদের সাহস তারিফ করার মত। কারণ এরা দিনের পর দিন অবাধে রাত্রি যাপনও করে থাকে। গভীর অরন্যে শঙ্খুল পরিবেশ এদের নিত্য দিনের বিষয়। এরা ভয়ঙ্কর বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। এদের ভাবনায় “বাঘের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বেঁচে আছি। অরন্যজীবনে এই মানুষগুলোর বনবিবি মায়ের কৃপায় এতবড় ঝুঁকি নিতে তারা ভয় পায় না। অনেক সময় কোন মানুষ যখন বাঘের কবলে পড়ে, তখন তাদের আক্ষেপ যে কোন রূপ অনাচার কিম্বা নিয়ম কানুনের প্রতি অনাচার হয়েছে কিনা, এটাই তাদের আলোচ্য বিষয়।

অরন্যজীব সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকার মানুষ জনেরা জীবিকার প্রয়োজনে নৌশিল্পের মাধ্যমে বনের মধ্যে অবাধে যাতায়াত করে। ছোট ছোট নৌকা নিয়ে তারা দিবা-রাত্রি কাঠ কাটা, মাছধরা, মধু সংগ্রহ করা, মোম সংগ্রহ করা- ইত্যাদি যাবতীয় কাজগুলো নৌকার দ্বারা হয়ে থাকে। গোসাবা, ক্যানিং, নামখানা, কুলতলি, কাকদ্বীপ, নূরপুর, ডায়মন্ডহারবার, বসিরহাট, হাসনাবাদ প্রভৃতি উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগণার নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ জনেরা। এমন কি পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমমেদিনীপুর, আসাম, বাংলাদেশ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা এই নৌকা নামক যাববাহনের মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন জীবিকা অর্জন করে চলেছে। যেহেতু সুন্দরবন কেন্দ্রিক যে জন্য এরা মা বনবিবি, দক্ষিণরায়, বড়খাঁ গাজী দেবদেবীর পূজার্তানার প্রচলন অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত হয়ে চলেছে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত জনজাতি জীবিকা নির্ভর করে তারা প্রত্যেকেই বনবিবি, দক্ষিণরায় বড়খাঁ গাজীর পূজাচর্চা করে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের কুসংস্কার লক্ষ্য করা যায়। তারা সুন্দরবনের গহন

অরন্যে কাঠুরিয়া জেলে, মৌলে, মৌলিয়ারা এরা মন্ত্রতন্ত্র তুকতাক ঝাড়ফুঁকের জন্য এক শ্রেণীর মানুষ গুনবিদ্যা করে থাকে। “বাউলের অপভ্রংশ বাওয়ালি” বলতে আসলে বোঝায় গোলপাতা সংগ্রহকারীদের। পরে সাধারণভাবে কার ও গোলপাতা সংগ্রহকারী উভয়কে বাওয়ালি বলা হয়। পৈত্রিক সূত্রে অথবা ‘বাউলের গুরু’র কাছে থেকে পাওয়া মন্ত্রতন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় গভীর জঙ্গলে কাজে যাওয়া দলে একজন করে বাউলে থাকত। বাউলের মূলকাজ জঙ্গলের বিপদ বিশেষত বাঘের আক্রমণ থেকে তার দলকে রক্ষাকরা। জীবিকার প্রয়োজনে বাউলদেরকে দিনের পর দিন থকতে হয় গভীর অরন্যে। এরা বাদাবনের বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী। সম্ভব বিপদ সম্পর্কে পূর্বভাষ দিতে পারে। মন্ত্রতন্ত্রের মাধ্যমে এবং মন্ত্রতন্ত্রের বাইরেও নানান সাবধানতা ও সংস্কারর মানতে তিনিই বাধ্য করেন অন্যদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি, আঞ্চলিক প্রক্ষিত এসবেই অনাদিকাল ধরে চলে আসলে বলা বাহুল্য একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়ে যখনকিনা কম্পিউটার ল্যাপটপ, যারা পৃথিবীকে গ্রাস করেছে, কিন্তু অরন্যজীবী নৌকারোহী নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষগুলো এখনো পর্যন্ত আদি কালের খরনাকে বহাল রেখেছে।

আঞ্চলিকতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় একই বনবিবি দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি নির্মান করে পূজার্চনা করে থাকে। হিন্দুরা দক্ষিণারায় বনবিবির সাথে পূজা করে থাকেন। মুসলিম প্রধান অঞ্চলের বনবিবি সাথে বড়খাঁ গাজী পূজা হয়ে থাকে। এর ইতিহাস পরবর্তী পর্যায়ে বিষদে আলোচিত হবে। সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের দু-ধরনের মূর্তির পূজা দিব্যমূর্তি ও বারামূর্তি। বারামূর্তি বা বারমুন্ড দক্ষিণরায় কে বলা হয়। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল দু-রকম মূর্তির কথা জানা যায়।

বাঘের উপর নাঞি দক্ষিণের বায়।

একখানি মুন্ডমাত্র বারা বলে তায় ॥

বড়খাঁ হানিল খাড়া গলায় তাঁহার।

মায়ামুন্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার ॥

বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর।

তারপর দোস্তনি পাইল দোহকার ॥

কাটামুন্ড বারাপূজা সেই হইতে করে।

কোনখানে দিব্যমূর্তি বাঘের উপরে ॥

দক্ষিণারায়ের বারা দেখিলেক কলে।

হরবর পুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে ॥^{১০}

দক্ষিণারায়ের দিব্যমূর্তি সুদর্শন, কখনো ব্যাঘ্রবাহন কখন বা অশ্বরোহী। অনেক সময় দক্ষিণারায়ের ভাই কালু রায়কেও দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় বেদীতে বারমূর্তির সঙ্গে একটি স্ত্রী মূর্তির ছবি দেখা যায়। এই স্ত্রী মূর্তিটি অনেকের মনে কারন দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর। মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে কেবলমাত্র রায়মঙ্গল কাব্যে এই রকম স্বাতন্ত্র্য চিত্র চোখে পড়ে। এবং রায়মঙ্গল কাব্যের ব্যাপ্তি অসীম। কারন ভারতবর্ষের গভী ছাড়িয়ে নেপাল, বাংলাদেশ, বনবিবি পূজা, দক্ষিণারায়, বড়খাঁ গাজী, প্রভৃতির পূজা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মির্জাপুর, আসাম, উত্তর- দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, দুই মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের পূজার্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিক আঞ্চলিক প্রেক্ষিত জানা যায়।

সর্বপরি সুদূর মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যের দেবী পূজিত হয়ে চলেছে। তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে কালের সীমা অতিক্রম করে অনাদি কালে বহমান। আঞ্চলিক বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরন ধারণ দেখা যায়। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারতবর্ষের এই পূজার্চনা স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মূর্তি, বিভিন্ন সময় এবং ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে আমাদের আকর্ষণ করে। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রীতি নীতি এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যরেখে তার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত আমাদেরকে আকর্ষিত করে। বাংলাদেশের নদীমাত্রিক এলাকার মানুষ জেনের জীবন জীবিকা সুন্দরবন নির্ভর হওয়ায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে আমাদেরকে বিশেষ আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা সপ্তদশ শতাব্দীর নির্মতা গ্রাম লাগোয়া কলকাতা, পূর্বমেদিনীপুর, প্রভৃতি স্থানে পূজার্চনা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে। এ সমস্ত স্থানে নিয়ম রীতির মধ্যে বিশেষ ঐক্যবোধ লক্ষ্যকরা যায়। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবা, বাসন্তি, ক্যানিং, নামখানা, পাথর প্রতিমা, নুরপুর প্রভৃতি স্থানগুলির মধ্যে আঞ্চলিক প্রেক্ষিত প্রায় একইরকম। আবার উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ, সন্দেশখালী,

বসিরহাট, বনগা, প্রভৃতি স্থানের আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে প্রায় একই রকম। অর্থাৎ 'রায়মঙ্গল' কাব্যের আঞ্চলিক গুরুত্ব দীর্ঘ সময় একই রকম ধরে অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এবং এই কাব্যের আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে অনেক বিষয় অনুধাবন করতে পারব।

মঙ্গলকাব্য বাংলার গণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি বাঙালীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাস, তার দৈনন্দিন জীবনচরণ আশা আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ বেদনা মঙ্গলকাব্য গুলিতে বাণীরূপ লাভ করেছে। সামাজিক বাস্তবতার গুনে মঙ্গলকাব্য গুলি বাংলার মধ্য যুগের সামাজিক ইতিহাসের প্রধানতম অবলম্বন। এই কাব্য গুলিতে স্বর্গের দেবতা বাঙালীর কল্পনায় মর্ত্যে অবতরণ করেছে। মানুষের দুঃখ সুখের অংশীদার হয়েছে। মাটির মানুষের যাবতীয় নীচুতা ক্ষুদ্রতা ও কপটতা সমস্তই ওঁদের স্পর্শ করেছে। তাতে তাদের দেবত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষত্বের গৌরব। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা মঙ্গল কাব্য ধারা প্রবাহিত। যদিও এর ও পূর্বে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই কাব্য ধারা ক্ষীণ আকারে ছিল। বংশ কৌলিন্যে তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী বহমান। প্রত্যেক মঙ্গল কাব্যের একটা নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য প্রধান মঙ্গলকাব্য মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এই তিন প্রধান মঙ্গলকাব্য তাদের শক্তিমান কবিদের স্পর্শে তা ভিন্ন স্তরে উপনীত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব' পটভূমিকা বিষয়গুলি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে একটা কথা স্পষ্ট যে প্রধানত লৌকিক গ্রামদেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্তনই মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল। অবশ্য লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য প্রচার কথাটি কোন ভাবেই স্তমিত হয়নি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী বিশেষ কিছু নেই। প্রধানত দেবতারাই এদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সমস্ত গ্রাম্য দেবতাদের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য কোন প্রভাবশালী লেখক ও অগ্রসর হয়ে আসেনি বলেই অপ্রধান মঙ্গলকাব্য গুলি আপন গোষ্ঠীর বাইরে বিশেষ পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। অপ্রধান মঙ্গলকাব্য গুলি প্রধান মঙ্গলকাব্য গুলির বহিরঙ্গ নিয়ে স্বাতন্ত্র্য মর্যাদায় আজও মর্ত্যবাসী সম্মানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত তাদের পূজার্চনা করে চলেছে।

অ-প্রধান মঙ্গলকাব্য হিসাবে আমরা যষ্ঠী মঙ্গলকাব্যকে আমাদের গবেষণার বিষয় হিসাবে তুলে ধরতে চাই। কিন্তু যষ্ঠী মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব বিষয়টি আমাদেরকে বিশিষ্ট্য ভাবে কৌতহলী করে। যষ্ঠী মঙ্গলের উদ্ভব বিষয়টি প্রাচীন কোন সংস্কৃত ও ধর্ম শাস্ত্রে যষ্ঠী দেবীর নাম পাওয়া যায় না।

যদিও ‘দেবী ভাগবত’ ‘ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ’ ইত্যাদী গ্রন্থে তাহার যৎ সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। “সমাজে ষষ্ঠীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কতকগুলি পরবর্তী পুরাণ তাঁহাকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু মনসা মঙ্গলচণ্ডীর মতোই ষষ্ঠী লৌকিক দেবী মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী যেভাবে কয়েক খানি পরবর্তী পুরাণে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেই উপায়েই, ষষ্ঠী দেবীও কয়েকখানি অর্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন।”^{২০} ষষ্ঠী দেবীর উদ্ভব বিষয়টি এ ভাবেই সূত্রাকারে আমাদের কাছে একটি গুরুত্ব পূর্ণতথ্য সূত্র পাওয়া গেল।

ষষ্ঠী পূজার অনুষ্ঠান বাংলাদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত। বলা বাহুল্য বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী পূজার বিবরণ পাওয়া যায়। এমনকি কবি কঙ্কন মুকুন্দ রাম চত্রবর্তীর চণ্ডী মঙ্গলেও ষষ্ঠীপূজার সন্ধান পাওয়া যায়। “রাজশাহী জেলার ক্ষীরহর গ্রামে প্রাপ্ত একটি চতুর্ভূজ ষষ্ঠীমূর্তির ক্রোড়ে একটি শিশু এবং দেবীর দোদুল্যমান দক্ষিণ পদটি উদ্ধমুখ একটি বিড়ালের উপর স্থাপিত হতে দেখা যায়। দেবীর উপরের দক্ষিণ হস্তে একটি সপত্র বৃক্ষশাখা রহিয়াছে। বগুড়া জেলায় দৃষ্টি অনুরূপ একটি মূর্তির হস্তে বজ্র দেখা গিয়াছে।”^{২১} রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় বাংলার ইতিহাসে প্রথম খণ্ডিত ৩১৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন “মদন পাল দেবের তৃতীয় রাজ্যাক্ষে একটি ষষ্ঠীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও এই মূর্তির কোন সন্ধান মেলে নাই।

বৌদ্ধদেবের তান্ত্রিক দেবতা রূপে হারীতীর সঙ্গে দেবী ষষ্ঠীর রূপের মিল পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য হারীতী এক যক্ষিণী কুবেরের স্ত্রী। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায়। বৌদ্ধজাতকে হারীতীকে শিশুর অনির্দিষ্ট করিনি। এবং মারী নিবারক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে একাধিক হারীতী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তির সহিত একাধিক শিশুর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিশুর বিদ্যমানতা থেকে মনে হয়েছে, হারীতী প্রজনন শক্তির দেবী। বাংলার মহিলাগণ সন্তানবতী হওয়ার পর ষষ্ঠী পূজার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। কারণ শিশু মৃত্যু বাংলার তথা সমগ্র দেশের লজ্জা। সে কারণে এই ষষ্ঠী পূজা ঘটা করে হয়ে থাকে। সন্তানের রক্ষার মানসে ষষ্ঠী পূজার এই প্রচলন সদূর পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত বহমান। সদুক্তিকর্ণা মৃত গ্রন্থে গ্রামদেবদেবীর মধ্যে কান্তার দুর্গাই হলো বনদেবী। কালক্রমে কান্তার দুর্গাই অরণ্য ষষ্ঠীর সহিত মিলিত হয়েছে। পৌষ মাসে যে ষষ্ঠীর পূজা হয় তার নাম অনুষষ্ঠী ফাল্গুন মাসে গো-রূপিনী ষষ্ঠী পূজা হয়।

যষ্ঠীর স্বরূপ অনুসন্ধানে দেখা যায় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে যষ্ঠী সম্বন্ধে বলা হয়েছে “মাত্রিকাগণের মধ্যে এই দেবী প্রধান। ইনি শিশুদিগের প্রতিপালনকারিণী এবং প্রকৃতির যষ্ঠীর স্বরূপিণী বলিয়া ইহার নাম যষ্ঠী। ইনি কার্তিকের স্ত্রী এই দেবীর প্রসাদে পুত্র পৌত্রাদী লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য ইনি ত্রি জগৎধাত্রী। এই জন্য দ্বাদশ মাসে ইহার উদ্দেশ্যে শুল্কপক্ষের যষ্ঠী তিথিতে পূজা করা হয়।”^{২২} প্রাসঙ্গিক ভাবে স্কন্দপুরাণে অষ্টাদশ মাসের দ্বাদশ যষ্ঠীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। বৈশাখ মাসে চান্দনী যষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্য যষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কদম্বী যষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন যষ্ঠী, ভাদ্রমাসে চপেটী যষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলক যষ্ঠী পৌষ মাসে অন্ন যষ্ঠী, মাঘ মাসে শীতল যষ্ঠী, ফাল্গুণে গৌরপিনী ও চৈত্রে অশোক যষ্ঠী, এই সমস্ত মাসে ঘটা করে যষ্ঠী পূজার প্রচলন নির্দিষ্ট তিথিতে সম্পন্ন হয়।

যষ্ঠী দেবী পৌরানিক মর্যাদা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কার্তিকেয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। ‘যষ্ঠী’ শব্দটি সংস্কৃত। পুরাণে মহান পাণ্ডুর পূর্বে তাকে কি নামে অভিহিত ছিল তা আজপর্যন্ত জানা যায় না। যষ্ঠী মঙ্গল কাব্যে যষ্ঠীর সহিত শিশুর সম্পর্ক বিদ্যমান। ‘যষ্ঠী’ শব্দটি ষাট-এর অনুকরণ বলে মনে করেন সমালোচক শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। ষাট বহুবচক সংখ্যা, এই হিসাবে ‘যষ্ঠী’ হইতে যষ্ঠী করা হইয়াছে। শীতল যষ্ঠীর প্রচলিত উপখ্যানে ষাটটি মতান্তরে পরিচয় পাওয়া যায়। নবজাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে যষ্ঠী পূজা প্রচলিত আছে। সমগ্র মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে যষ্ঠী ব্যাতিক্রমী দেবী কারণ সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পূজার্চনা আমাদের সমাজের নারী পুরুষ উভয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত করে থাকে। কিন্তু যষ্ঠী পূজা কেবল মাত্র মহিলারাই করে থাকে। শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিবসে যষ্ঠী পূজা সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে শিশুর ভাগ্য ও নির্ধারণ করে দেয় যষ্ঠী দেবী। এমনি বিশ্বাস আমাদের সমাজের সমস্ত নারী জাতির।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৃন্দাবন দাস ‘চৈতন্য ভাগবত’ গ্রন্থে চৈতন্য দেবের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে যষ্ঠী পূজা হয়েছিল এমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের আলোচিত কৃষ্ণরাম দাস বিরচিত যষ্ঠীমঙ্গল কাব্য যার রচনা কাল ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯-৮০ খ্রীঃ অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতেই কবি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত অংশ অত্যন্ত ছোট, দশটি মাত্র পদের সমন্বয়ে এই কাব্য সম্পন্ন। যষ্ঠীদেবী উদ্ভব বিষয়ে কৃষ্ণরাম দাস তাঁর যষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেন। যষ্ঠীদেবীর একান্ত

সহচরী লীলাবতী নানা দেশ ঘুরিয়া দেবী ষষ্ঠী পূজা মর্ত্যে মানবের মাঝে কিভাবে সম্ভব হল তার একটি পদে দেখা যায় বিভিন্ন দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া সপ্তগ্রামে এসে পূজা প্রতিষ্ঠা পায়। সেখানে লীলাবতী সঙ্গে ষষ্ঠীবুড়ি বামনীর রূপ ধারণ করে। সপ্তগ্রামের রাজা শত্রু জিতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। সপ্ত গ্রামের রানি সোনায়ে পিঁড়ায় বসিয়া মাছপোড়া দিয়া ভাত খাবার সময় লীলাবতী প্রবেশ -

“কাঁকেতে চুপড়ি তাহে তুলসীরপাত
গঙ্গা মৃত্তিকা খানিক ফুল কত জাত।
হাতে সিগে বেত নড়ি বুড়ি মায়াধর
ধীরে ধীরে উত্তরিল রানির গোচর।
যাইতে আটক তায় না করে দরানি
সখী দিল বসিতে আসন এক খানি
কৌতুকে ভোজন করে রাজার মহিষী
মাছ পোড়াএ খায় কনকাসনে বসি।”^{২৩}

সপ্ত গ্রামের রানির পরিচয় জানতে চাইলে, দেবী জানান বর্ধমানের আমার বাড়ি, সেখানে তার সাত ছেলে ও এক মেয়ে আছে। দেবী গঙ্গা স্নান সম্পন্ন করে রাজ প্রাসাদে ষষ্ঠী পূজা করবে এবং ষষ্ঠীর ইতিহাস সপ্ত গ্রামের রানিকে অবহিত করে। সায় বেনের পত্নী মা ষষ্ঠীর আশীর্বাদ ধন্য হয়ে সাত ছেলের মা হয়েছে। তাহার ছোট বউ গর্ভবতী অবস্থায় ষষ্ঠী পূজার নৈবেদ্য চুরি করে খেয়ে ফেলে। এবং কালো বিড়ালের দোষ দেয়। পরবর্তীতে ছোট বউ এর যতগুলো সন্তান হয় সবগুলি কালো বিড়াল চুরি করে নিয়ে নেয়। শেষ সন্তানটি ছোটবউ লুকিয়ে বনে গিয়ে প্রসব করে। কিন্তু কালো বিড়ালের হাত থেকে সপ্তম সন্তানটিকে রক্ষা করতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। ষষ্ঠী দেবী ছোটবউ-এর প্রতি প্রসন্ন হল এবং তার সাত সাতটি সন্তান ফেরত দিল। এই ঘটনার পর থেকে ছোটবউ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত ষষ্ঠী পূজার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং এই ভাবে জগতে দেবী ষষ্ঠী নারী সমাজে সাদরে গৃহিত হল। বলা বাহুল্য উচ্চ সমাজের প্রতিনিধি পূজা করলে তবেই এই মঙ্গলকাব্যের দেবীরা সার্বিক পূজা পেয়ে থাকে। “চাঁদ মণ্ডাগারের সঙ্গে সংগ্রামে সে এক ভীষণ ধ্বংসকারী রূপে আত্ম প্রকাশ করেছে। ছলে বলে কৌশলে কোন কিছুতে পিছপা হয়নি। দয়া মায়া প্রীতি ন্যায় কিছুই তোয়াক্কা করেনি। চাঁদ

সওদাগারের ছয় বালক পুত্রকে ভাতে বিষ মিশিয়ে গুপ্ত হত্যা করেছে।”^{২৪} ষষ্ঠী মঙ্গলে সাত সাতটি সন্তানের আত্মগোপন এবং দেবীর পূজা আদায় এ সব মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের ধারা বাহিত ঘটনার প্রবাহ বললে অত্যাুক্তি হয় না।

ষষ্ঠী দেবী এবং তার সহচারী লীলাবতী পূজা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেন কৃষ্ণরাম দাস তাঁর পদে উল্লেখ করেন।

“রাড় গৌড় দিল্লী মল কলিঙ্গ কপাল

গয়া পহিরাগ কাশী নিষাদ নেপাল।”^{২৫}

প্রভৃতি স্থানে ষষ্ঠী পূজা প্রচার লাভ করেছে। বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক পল্লিতে ষষ্ঠী পূজা এবং ষষ্ঠী তলা চোখে পড়ে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়েরা বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে ষষ্ঠী পূজার তিথিতে পূজা করে থাকে। যে সমস্ত গ্রামে বারোয়ারী ষষ্ঠী তলা নাই “বিশেষত পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে, সেখানে সাধারণত গৃহে দেবীর পূজা করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীতলা কিন্ম গৃহে পূজিতা ষষ্ঠী দেবীর সাধারণত কোন মূর্তি নাই, অনেক স্থলে প্রস্তর নির্মিত মনসার মূর্তি ষষ্ঠী বলিয়া পূজিতা হয়”। যাইহোক ষষ্ঠী পূজার প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষ ভাবে পূজার্চনা করে থাকে “বাংলাদেশের স্ত্রী সমাজ প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন মনোভাষে মিশিয়ে ষষ্ঠী ঠাকুরণের পূজার্চনা প্রচলিত হয়”।^{২৬} ষষ্ঠী পূজা পুরুষ সমাজে চোখে পড়ে না, যে টুকু পূজার্চনা হয় সমস্তই নারী সমাজের দ্বারা। ষষ্ঠীকে নারী সমাজের দেবী বললে অত্যাুক্তি হয় না। সমগ্র বঙ্গবাসী নারী সমাজ সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা ধুমধাম করে বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট তিথিতে করে থাকে। তৃতীয় অংশ ষষ্ঠী পূজার বিধান বর্ণিত হয়েছে। বারমাসে অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে ষষ্ঠী পূজা করিতে হবে। যে এই নিয়ম মেনে পূজার্চনা করে “রোগ শোক দুঃখ কভু নহে তার ঘরে।”^{২৭} হাঁড়িয়া ভালের নুড়ির সহিত আঁড়সের গুলি মিশাইয়া ভোগ প্রস্তুত করা হয়। এই পূজা সোম এবং শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের সবদিন সমভাবে

‘ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্যের যে পুঁথিটি আমরা পেয়েছি সেটি কবি কৃষ্ণরাম দাস রচিত। এতে মাত্র দশটি পদ আছে। তবে পুঁথিটি অসম্পূর্ণ। ষষ্ঠী মঙ্গলের তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য পুঁথি পাওয়া যায় না। আমরা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে তিনজন লেখকের নাম পেয়েছি - কৃষ্ণরাম দাস, রুজু রাম এবং শঙ্কর। কৃষ্ণরাম দাস বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে বিশেষ জনপ্রিয়। গাঁচ খালি (ফাল্গুন মঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, ষষ্ঠী মঙ্গল, রায় মঙ্গল, কমলা মঙ্গল) মঙ্গল কাব্য

রচনা করেন। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠী মঙ্গলে ষণ্ড গ্রাম একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং ঐ নগরের ঐশ্বর্য ঐতিহ্য কাব্য মধ্যে কবি বর্ণনা করেন। পুঁথিটি খন্ডিত হওয়ায় বর্ণনার বিশদ যানা যায় না। কৃষ্ণরাম রচিত ষষ্ঠী মঙ্গলের কাহিনিটি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত কথা প্রচলিত আছে।

ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্যের আঞ্চলিক প্রেক্ষিত এই কাব্যকে ব্যাখ্যাদান করে। কাব্যটির মধ্য দিয়ে যে পূজার্চনা প্রচলন আছে তা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়ম দেখা যায়। ষষ্ঠী মঙ্গল এবং ষষ্ঠী পূজা দেশের গভি পেরিয়ে পূর্ব বঙ্গের বিশেষ করে খুলনা, বরিশাল, ময়মন সিংহ, পাবনা, যশোর, ঢাকা, প্রভৃতি অঞ্চলে পূজার প্রচলন আছে। ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্যের অপর কবি রুদ্র রাম যিনি স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে ষষ্ঠী পূজা এবং ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের যে বৈশিষ্ট্য স্বপ্নাদর্শন তা ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্যে বিদ্যমান। এমন কি বাংলাদেশের খুলনা পরগণার এই কবি তার কন্যার রোগ মুক্তির জন্য ষষ্ঠী পূজা করেছিল। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই পূজা প্রচলন বেশি।

ষষ্ঠী পূজা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আজও ঘটা করে হয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায়, মেদিনীপুর বিশেষত পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমমেদিনীপুর, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এই পূজার প্রচলন আছে। বিভিন্ন পল্লিতে ষষ্ঠীতলা বলে একটি স্থান আছে। সেখানে নিয়ম করে ষষ্ঠী পূজা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বারোয়ারী ষষ্ঠীর পূজা হয়। যেখানে বারোয়ারী ষষ্ঠীর স্থান নাই, সেই সমস্ত অঞ্চলে বাড়ীতে বাড়ীতে পূজা হয়। সন্তানের মঙ্গল কামনার মায়েরা এই পূজা ঘটাকরে করে। এই বঙ্গদেশে বর্তমানে সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠী পূজা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সবাই সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই পূজা সমাজে বহুল প্রচলিত। অনেক মায়েরা সু-সন্তানের আশায় মা ষষ্ঠী দেবীর কাছে মানদ করে। এমনকি যাদের সন্তান হয় না, তারাও এই পূজা যত্নসহকারে করে থাকে। আবার যাদের সন্তান জন্মের পরে থেকে রোগে শোকে মারা যায় তারাও মায়ের মানদ করে। ষষ্ঠী মায়ের ব্রত কথা পাঠ এমন কি গ্রামীণ যাত্রাপালা সহকারে ষষ্ঠী পূজা পালন করে। মেদিনীপুরের বিশেষ করে পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং মেদিনীপুর লাগোয়া পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যাতে এই পূজা হয়।

ষষ্ঠী পূজা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা আসাম এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই পূজার্টনা বর্তমানে প্রচলন আছে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে যখন কিনা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের রমরমা, আর সেই স্থানে বিজ্ঞানের পাশাপাশি প্রাচীন বিশ্বাসকে মানুষ আজও অত্যন্ত যত্ন করে তার প্রচলিত আমাদেরকে অবাক করে দেয়। মানুষের অধ্যাত্মিক বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস অটুট। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের যে অধ্যাত্মিক ধর্মীয় বিশ্বাসে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন সংস্কারগত কিছু পরিবর্তন আদর্শগত ঐতিহ্যের ধারা বাহিকতা আজো আমাদের সমাজে বহমান।

তুর্কী আক্রমণে বিপর্যস্ত অসহায় বাঙালী জীবনে বিশেষ ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল। তারই এক সাহিত্যিক প্রকাশ মঙ্গলকাব্য। এই ভক্তিবাদের মূল কথা ছিল আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং দেবানুগ্রহে পরম নির্ভরশীলতা। অনার্য লৌকিক উপাদানের উপর অর্থ ঐতিহ্যের প্রলেপ সঞ্চারে এই ভক্তিবাদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। একধারে ত্রেগুপরাযণ ও ভক্তিবৎসল মনসা, চতুর্, শীতলা, ধর্মঠাকুর প্রমুখদেবদেবী মন্ডলী ছিলেন এই ভক্তিবাদের উপাস্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে গার্হস্থ্য-কল্যানকর যে পাঁচালী ও ব্রত কথার ধারা প্রবাহিত ছিল পঞ্চদশ শতকে তাই সংহত হয়ে সাহিত্যিকরূপ মঙ্গলকাব্যে পরিণতি লাভকরে। ‘মঙ্গল’ কথাটির আভিধানিক অর্থ ‘কল্যান’ ঋকবেদে গৃহ কল্যাণ অর্থে শব্দটি প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান রূপে অশোকানুশাসনে, দেবলীলা গীতি হিসাবে হরিবংশ ‘মঙ্গলম’ উজ্জ্বলগীতি বলেছেন। প্রাচীন মঙ্গল কাব্যে ‘মঙ্গলাসুর’ বধের কাহিনী আছে। বঙ্গদেশে এবং আসামে মঙ্গল বিবাহ সংগীত অর্থে প্রচলিত ছিল।

আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, “দেবতার আখ্যানময় পাঁচালী কাব্যের নামে দেবতার নামের পরে ‘মঙ্গল’ কথাটির যুক্ত থাকে (কখনও কখনও “বিজয়’ মঙ্গল ও বিজয় দুইয়) এই জন্য এগুলির এখন নাম দাঁড়াইয়াছে ‘মঙ্গলকাব্য। মঙ্গল শব্দটির অর্থ গৃহকল্যাণ।”^{১৮} (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস) এই গ্রন্থেই তিনি ‘বিজয়’ এবং ‘মঙ্গল’ শব্দদুটিকে প্রায় সমার্থক বলে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন। ‘কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে ‘মঙ্গল’ ভক্তির চোখে দেখিলে ‘বিজয়।’ যদিও ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রণেতা আশুতোষ ভট্টাচার্য ভিন্নমত পোষণ করেন।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী মোটামুটি এই সময় কালের মধ্যে বাংলা মঙ্গল

কাব্যগুলি রচিত। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কাব্যই এই ধারার প্রধান ফসল। অন্যগুলির মধ্যে আছে অন্নদামঙ্গল, শিবায়ণ, শীতলামঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, প্রভৃতি কাব্যের দেবদেবী অধিকাংশ পৌরাণিক হলেও লৌকিক সংস্কার ও চেতনার সমন্বয়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা ছিল সমাজের শিষ্টজন। সংস্কৃত পুরাণগুলিই তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছিল। তেমনি ছিল সমাজ জীবনের লোকায়ত মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা এঁদের কাছে যুগ সমাজের দাবী ছিল, সমাজের বিশালয়তন নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দেবদেবীদের জাতে তোলা এবং ঐ বৃহৎ জন গোষ্ঠীর সুখ দুঃখ জড়িত জীবন চিত্রকে কাব্যে প্রতিফলিত করা।

প্রতিহিংস পরায়ণ দেবরোষের বিচিত্র সর্পিল আক্রমণ পর্যুদস্ত অবরুণ আত্মনাদ পদে পদে পুরুষ্কারের লাঞ্ছনা, অজানা ভয়তাড়নায় বিপর্যস্ত সংসার পুত্র পরিবার এবং শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের অতল গহুরের মুখে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাচারী দৈবের পায়ে অসহায় মানুষের বাধ্যতামূলক আত্মসমর্পণ। সব মিলিয়ে এমনই প্রতিকারহীন ত্রস্রকুটিল দেবশাসন নিয়ন্ত্রিত জীবন গাথাই মঙ্গলকাব্য গুলির উপজীব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় ‘শীতলামঙ্গল’। শীতলা মঙ্গল কাব্য রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন তারা হলেন- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, কবি বল্লাভ মানিকরাম গাঙ্গুলী এবং কৃষ্ণরাম দাস,। মঙ্গল কাব্য ধারা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। শীতলামঙ্গল কাব্যের কবিরা বিভিন্ন সময় তাদের কাব্যকে স্বপ্লাদেশ স্বতঃপ্রনোদিত, অথবা কল্যাণ কামনায় রচনা করেন। তবে বিশেষ করে এই কবিদের রচিত শীতলা মঙ্গল পূর্ববর্তী মঙ্গল কাব্য গুলির ধারা বাহ্যিকতার প্রবাহ। বংশ কৌলিন্যে এরাও প্রাচীন। শীতলা মঙ্গল কাব্যের কবিগণ- নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম দাস, কবি বল্লাভ এবং মানিক গাঙ্গুলী প্রমুখ শীতলা মঙ্গল অপ্রধান মঙ্গল হলেও এই কবিদের মধ্যে সবচেয়েও শক্তিশালী কবি হিসাবে নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল কাব্যে আমাদের আলোচনার বিষয়ক। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় ভারতবর্ষের - পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মথুরা, বারানসী প্রভৃতি স্থানে শীতলা মঙ্গলের যে পুঁথি প্রচলিত আছে তা কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গল কাব্য এই শীতলামঙ্গল কাব্যটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রা সহকারে বা গীত সহকারে পূজার্চনা হয়ে চলেছে।

শীতলামঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা শীতলা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিষ-চিকিৎসা প্রকরণের বসন্তরোগের অধিকাংশ দেবী রোগ প্রশমনকারী বলিয়া শীতলার গুরুত্ব অপরিমীম। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ‘ভাই প্রকাশের মসুরিকা চিকিৎসায় যে স্থলে শীতলার স্তর বর্ণনা আছে, তাতে স্পষ্ট করে

বলা আছে স্কন্দপুরানান্তর্গত ‘কাশীখন্ড’ ইহঁতে শীতলার স্তব পাওয়া যায়। “শীতলার পূজারীদিগের বিশ্বাস এই দেবীর বর্তমান পূজাবিধান পিচ্ছিলাতন্ত্র ইহঁতে’ সংকলিত ও তাঁহার ধ্যান ‘স্কন্দপুরান’ ইহঁতে গৃহীত।”^{২৯} শীতলা লৌকিক দেবী, হিন্দুদের পৌরাণিক অভিজ্ঞতা, হিন্দুদের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং তাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। শীতলা লৌকিক দেবী হওয়ার কারণে - বৈদিক সাহিত্যে ইঁহার খোঁজ করা বৃথা। এই দেবীর আচার-আচরণ, মূর্তি পরিকল্পনা সমস্তই উন্নত আর্য সমাজের দেবী পরিকল্পনা বিরোধী। শীতলা দেবী বসন্তরোগ থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। কিন্তু বসন্তরোগ গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ব্যাধি। অতএব বৈদিক সাহিত্যে ইঁহার কোন সম্পর্ক সম্ভব নয়। শীতলাদেবীর মূর্তি পূজা আমাদের সমগ্র দেশে প্রচলিত। কিন্তু এই দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় “কেহ কেহ শীতলার মূর্তি ও পূর্বোদ্ধৃত ধ্যান মন্ত্রের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অপদেবীর সহিত তাঁহার সম্পর্কে কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু অনার্যদের সমাজ ইহঁতে যে এই দেবীর উৎপত্তি ইহঁয়াছে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।”^{৩০} শীতলা দেবীর উদ্ভব বিষয়ে - “বৌদ্ধ সমাজের হারীতী ইহঁতেই পরবর্তী বাংলা সমাজে লৌকিক দেবতা শীতলার উদ্ভব ইহঁয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।”^{৩১} যদিও পরবর্তী কালে বৌদ্ধ হারীতীর সহিত শীতলার সাদৃশ্য সন্ধ্যানে যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। বিশ্বকোষকার নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন “তন্ত্র ও শীতলা অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শীতলা অনার্য সমাজ ইহঁতে উদ্ভব ইঁহার সহিত বৈদিক সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই।” যাইহোক শীতলাদেবীর উদ্ভব বিষয়ে শীতলা মঙ্গলের কবিগণের (নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, বল্লাভ, মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রমুখ) মধ্যে আদি কবি হিসাবে কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলা মঙ্গল কাব্যটি আমাদের গবেষণার বিষয়।

প্রখ্যাত কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী তাঁর শীতলা মঙ্গলকাব্যে - শীতলার উদ্ভব বিষয়ে তাঁর যে কাব্য নিত্যানন্দ কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা হল—

“করিল পুত্রোপ্তি যজ্ঞ নহুয রাজন।

কত মুনি ঋষি আইল কে করে গণন ॥

নিব্বল্লৈ করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।

ইহলোক পূর্ণ যজ্ঞ শান্তমতি ॥

যজ্ঞপূর্ণ নিভাইলে যজ্ঞের অগল।

তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল ॥

মস্তক ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
 দেখি প্রজাপতি তারে যত্নে সুখাইলা ॥
 কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিনী।
 কি হেতু অগ্নিতে ছিল কহ সে কাহিনী ॥
 দেবী কন, অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম ইল ॥
 কোথা যাই, কি করিব, পরাণ বিকল।
 শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন ॥
 যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম।
 সেহেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
 মম বাক্যে যাও তুমি শীঘ্র ভূমন্ডল ॥”^{৩২}

‘শীতলা’ শব্দটি পৌরাণিক প্রভাব জাত বলে মনে করেন আশুতোষ ভট্টাচার্য। বসন্তরোগের উপশমকরিতা দেবীর নাম বিপরীতোক্তি (euphemistic tendency) তে শীতলা হয়েছে, যদিও ধ্যান তাহাকে ‘বিস্ফোটকাদূর্গপ্রতাপশমনকারী’ বলা হয়েছে। এই শীতলা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ।

দাক্ষিণাত্যে শীতলান্মা বলিয়া এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও দাক্ষিণাত্যে গ্রাম্য জলদেবতাগণই বসন্তরোগনাশিনী বলিয়া মনে করা হয়। আবার মসলিপট্টম জেলায় গঙ্গান্মা বলিয়া জলদেবতাই বসন্তরোগের দেবী হিসাবে কল্পিত, যে শীতলাদেবী জল মধ্যে পূজিত হয়ে থাকে। কাশীতে যে শীতলা মন্দির আছে তাহা জলের মধ্যে অবস্থিত। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এই মন্দির জলে ডুবে যায়। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা যায় দাক্ষিণাত্যের এই শীতলা এবং বাংলার শীতলা অভিন্ন নয়। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন উপদেবতা বাংলার লৌকিক দেবতার পরিনত হয়েছে। শীতলা মা তাদের অন্যতম। মহীশূর জেলায় হাম ও বসন্তের দেবী নাম ‘সুখজন্মা’ আরকটি জেলায় তাহার নাম ‘কন্নিয়ন্মা’ ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম্য দেবতা ‘মরী আন্মার’ রূপান্তর মাত্র। এই দেবতার বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নাম মানবের রোগভীতি থেকে এই সব দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের শীতলান্মা বাংলায় আমাদের সমাজে রূপান্তর হয়েছে।

শীতলার নির্দিষ্ট কোন মূর্তি নাই, প্রস্তর খণ্ডে এই দেবী পূজার্চনা করা হয়। পূজারীগণ

এই প্রস্তরখণ্ডে সিঁদুর লাগিয়া পূজা করে থাকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলকাতায় যে ধর্ম মন্দিরের কথা বলেছেন সেখানে ধর্ম মূর্তি আসনের নীচে শীতলা মূর্তি ছিল। এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন- “Below there is a stone with eruptions representing small pox. This is Shitala.”³³ ব্যোমকেশ মুস্তফী বলেন শীতলা পণ্ডিত দিগের “শীতলা করচরণহীনী, সিঁদুর লিপ্তাঙ্গী, শঙ্খরা ধাতুখচিত ব্রণ-চিহ্নাঙ্কিতা মুখমন্ডল মাত্রা বিশিষ্টা প্রতিমা মাত্র।”^{৩৪} এই ক্ষুদ্র ব্রণ চিহ্নাঙ্কিত শিলাক্ষণ্ডই শীতলার প্রাচীনতম রূপ। পরবর্তী সময়ে ময়ূরভঞ্জ জেলা থেকে শীতলার মূর্তি সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই শীতলা দেবীর যাবতীয় গুরুত্ব গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে বসন্ত রোগ হাম-জ্বর রোগের উপশমকারী হিসাবে তার পরিচিতি গোটা ভারত বর্ষের।

শীতলা মঙ্গলের আদি রচয়িতা কে, এ প্রশ্ন সকলের কাছে আমরা শীতলা মঙ্গলের কবি হিসাবে দ্বিজনিত্যনন্দ চক্রবর্তী, কবি বল্লভ এবং মানিক রাম গাঙ্গুলীর নাম পেয়েছি। তবে এদের

মধ্যে মানিক
কাব্যখানি
কালে প্রকাশিত
কাব্যের কোন
কাহিনী পাওয়া
এবং এই কবির
পালায় বিভিন্ন
সমাবেশ
পুঁথিটি পূজাচনা
শীতলা যাত্রা



দক্ষিণ ২৪ পরগণার রামপুর গ্রামের
দেবী বনদ্রিবি এবং দক্ষিণবায়

বামেব
সাম্প্রতিক
হয়েছে। এই
নির্দিষ্ট
যায় না।
বিভিন্ন
ঘটনাব
হওয়ায় এই
এবং
পালায়

তেমন গুরুত্ব পায় না। কবি বল্লভের শীতলা মঙ্গল কাব্য ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে বলেন তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিলেন। তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তাঁর ভাষা মার্জিত নয় এবং কাব্যের গঠন ভাষা তেমন উল্লেখ নয়। কিন্তু দ্বিজ নিত্যনন্দ শীতলা মঙ্গললের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। তার কাব্যের কাহিনী, ভাষা, ছন্দ অত্যন্ত সুন্দর। কেউ কেউ কবিকে আদি কবি বলেন আসলে এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিলেন

বলে সমালোচকেরা মনে করেন। তিনি উড়িষ্যার কবি ছিলেন না, তিনি বাংলা ভাষায় কবি ছিলেন। তাঁর রচিত শীতলা মঙ্গলের মার্জিত এবং সহজ সরল। এই কবি তাঁর পরিচয় দান করেন- ‘গোলুক পদালয়’ তার এক স্থানে লিখেছেন-

‘সৌতিসয় সর্বশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।

তারপুত্র চিরজীব, কিণ্ডনে তুলিনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর ॥

মহামিশ্রতস্যতমজ, শ্রীরাধাচরণানুজ, চৈতন্য তাহার নন্দন।

তাহার মধ্যম ভ্রাতা, শ্রীনিত্যানন্দ নামঘুত, গাহে ভেবে শীতলা চরণ ॥” ৩৫

তাঁহার বাসস্থান কাঁটাদের ডিভিসাঞ্চি গোত্র ভরদ্বাজ। তিনি মেদিনীপুরের রাজা কাশী ঘোড়ার সভাসদ ছিলেন। ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মনে করেন - “নিত্যানন্দের পৃষ্ঠপোষক রাজানারায়ণ অভিন্ন। রাজানারায়ণের সভায় ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘ব্রহ্ম বেদ-পুরাণের অন্তর্গত গণেশ খন্ড’ এবং ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ বৃহন্নরদীয় পুরান অনুলিখিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী এই সময়ে বর্তমান ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।” ৩৬ সুতরাং দ্বিজ নিত্যানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিজ নিত্যানন্দ বিরচিত ‘শীতলামঙ্গল’ বা শীতলার জাগরণ পালা’ অর্থাৎ শীতলার ধ্যান, প্রকারান্তর, প্রণাম মন্ত্র পূজা, শীতলার বন্দনা, নিমা জগতিই পালা এবং অষ্টমঙ্গল ও অষ্টোত্তর শতনামমালা, এই পালা গুলি দ্বিজ নিত্যানন্দ অত্যন্ত ঘটনা বহুল এবং প্রত্যেক কাহিনী পর্যায় ব্রহ্মিক ভাবে সাজানো। কবির রচিত শীতলা মঙ্গলের ঘটনার আঙ্গিকে এবং বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্যতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঘটনার সমাবেশের পাশাপাশি সুন্দর শব্দ চয়ন, বাক্যের সহজ সরলতা, আলংকরিক দক্ষতার পাশাপাশি পয়ারাদি ছন্দে কাব্যখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এবং দ্বিজ নিত্যানন্দের কাব্যটি সারা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ শীতলার গুরুত্ব সহকারে আজো চর্চিত। দক্ষিণবঙ্গের বিশেষ করে উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া আসাম, উড়িষ্যায় কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী রচিত কাব্যটি সাদরে গৃহীত হয়েছে। কোন কোন সময়ের কবিকে উড়িষ্যার মানুষ বলেছে। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তার কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কারণ তার রচিত শীতলা মঙ্গলের ভাষা আধুনিক বাংলার মতই। এবং বাংলা ভাষা ভাষি মানুষ

জনেরা এই কাব্যের গুরুত্বকে স্বীকার করেছে।

আধ্বলিক প্রেক্ষিত কাব্যের মহিমাকে এবং কাব্যগুণকে অসীমতা দান করে। শীতলা মঙ্গলকাব্য সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য ধারার বিশেষ প্রেক্ষিতে আছে। যদিও বংশ কৌলিন্য এরাও অনেকখানি প্রাচীন। সম্প্রতিক কালে এদের গুরুত্ব সমগ্র সাহিত্য ভাবনাকে আত্ম সমীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। যাইহোক মানুষের জীবন চরণে এই সমস্ত দেব দেবীর মূল্য আজো অপরিসীম শীতলা দেবীর পূজা শুধু বঙ্গদেশে নয় সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে এই দেবী আজোও পূজিত। সেকেন্দার লোদী (১৪৮৮-১৫১৬ খ্রীঃ) মথুরার মন্দির সমূহ ধ্বংস করিয়া হিন্দু দিগকে শীতলা পূজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কাশীতে দশাশ্বামেধ ঘাটের উপর এক বহু প্রাচীন শীতলা মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশে সাসারামের অন্তর্গত শীতলা মন্দিরের নির্দেশন আজো অমলিন। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শীতলা মন্দির এবং শীতলা পূজা আজো বহমান। মধ্যপ্রদেশে শীতলা পূজার প্রচলন আছে। পুনর কন্যার বিহার উপলক্ষে শীতলা পূজা দেওয়া হয়। বোম্বাই প্রদেশ পুত্র সন্তান লাভের জন্য শীতলা পূজা করে থাকে।

ময়ূরভঞ্জে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার কয়েকটি শীতলা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ‘ময়ূরভঞ্জে ধর্মের মন্দিরের সংলগ্ন যে শীতলা মূর্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তাহার সহিত পিচ্ছিলাতন্ত্রে বর্ণিত শীতলার ধ্যান ও মূর্তির সাদৃশ্য দেখা যায়। নেপালে প্রায় প্রত্যেক ধর্ম চৈতন্যই শীতলার মূর্তি দেখা গিয়াছে।’^{৩৩} আসামে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, প্রায় সর্বত্রই বসন্ত রোগের দেবীর নাম ‘আই’ এবং এই ‘আই’ অসমীয়া লোক গীতিতে বহুল প্রচলিত। আসামে কাহারো বসন্ত রোগ হইলে ‘আই’ নাম কীর্তন করা হয়। শীতলা বলিয়া কোন দেবতার নাম তারা জানে না, এই নামটি শুধু মাত্র আসামেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু বঙ্গদেশে শীতলা পূজা ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন সংলগ্ন গোসাবা, বাসন্তি, কুলতলি, পাথর প্রতিমা, সাগরদিঘি, ক্যানিং, মথুরাপুর, জয়নগর, সাতজেলিয়া, নামখানা প্রভৃতি স্থানে এই দেবীর মূর্তি নির্মান করে মন্দির সহযোগে যাত্রা গান সহ মানুষ বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে পূজার্চনা করে চলেছে। আজোও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রোগে জর্জরিত মানুষ মা শীতলার কাছে মানসিক করে এবং তাদের রোগ উপশম হলে তারা দেবীর কাছে তাদের মানসিক শোধ করার পাশাপাশি শীতলা যাত্রা সহ আনন্দ অনুষ্ঠান করে থাকে। বাংলার সংস্কৃতির একটি অংশ হল শীতলা পূজা।

শীতলা পূজাদক্ষিণ ২৪ পরগণার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগণার নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা শীতলা পূজা অত্যন্ত জাগজমক সহকারে করে থাকে। মিনাখাঁ, হাড়োয়, সন্দেশখালী, হাসনাবাদ, হিজলগঞ্জ প্রভৃতি ব্লকের হিন্দু জনজাতির মানুষ জনেরা অত্যন্ত ভ্রাদ্বাসহকারে শীতলা পূজা করে থাকে। বিশেষ করে ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার সময় এরা দোল উৎসবের পাশাপাশি শীতলা পূজা সহ শীতলা যাত্রা করে থাকে। তবে অনেক সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার কোথাও কোথাও ভাদ্র মাসে শীতলা পূজার প্রচলন আছে। শীতলা পূজার জন্য নির্দিষ্ট মন্দির আছে। এবং এই মন্দিরে মূর্তি নির্মাণ করে শীতলা পূজা হয়ে থাকে। শীতলা পূজা বারোয়ারী পূজা হিসাবে বিশেষ সময়ে এই পূজা করে চলেছে। অনেক সময়ে আর্থিক সচ্ছলতার সংগতি সম্পন্ন পরিবারে শীতলা মন্দির চোখে পড়ে। এই পূজায় কোন কোন সময় পুরোহিত ছাড়াই পূজা করে, বিশেষ করে বারোয়ারি পূজার ক্ষেত্রে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাড়ীতে বাৎসরিক পূজা হিসাবে পূজা করে থাকে সে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পুরোহিত থাকে। এছাড়া শীতলা যাত্রা সহযোগে এই পূজা হয়ে থাকে।

শীতলা পূজার আঞ্চলিক প্রেক্ষিত সুদূর প্রসারী বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলায় এই পূজার প্রচলন আছে, তবে উত্তর ২৪ পরগণা কিংবা মেদিনীপুর জেলার মত বহুলনয়। আসলে এই পূজা নির্ভরতা কিংবা দেব নির্ভরতা অনেক সময় অরাজগতা রাজনৈতিক পালা বদল এখানে বিশেষ গুরুত্ব পায়। “অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক পালা বদলের ইতিহাসে কিছু প্রভাব এখানে থাকতে পারে। সাধারণ মানুষ যখনই কোন অকাজকতার সম্মুখীন হয়েছে তখনই দেবকে আশ্রয় করতে চেয়েছে।”^{৩৮} আসনে মানুষ প্রকৃতির কাছে বড় অসহায় সে কারণে তারা রোগ ব্যাধির দেবী হিসাবে বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর নির্ভরশীল। কেবল মাত্র বসন্ত, পক্ষ এই রোগের ক্ষেত্রে মা শীতলার উপর বিশেষ নির্ভরশীল।

মেদিনীপুর জেলার বিশেষ করে কাসারিয়া, দিঘা, গেওখালি, শালবনী, বোয়ালতোড়, কলাইকুন্ড, খড়্গাপুর, হেড়িয়া, দাদন পত্রবাড়, জুনপুর, মুকুন্দপুর, হিজলি, পিছাবনী, প্রভৃতি স্থানে শীতলা পূজা বহু প্রাচীন থেকে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত। এখানে বারোয়ারী শীতলা মন্দির প্রচুর আছে। মেদিনীপুরের মানুষ জনেরা পূজার পাশাপাশি শীতলা যাত্রা সহ বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানে এরা খুব খুশি তাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ জনেরা ব্যক্তিগত ভাবে পূজা করে। শুধু তাই নয় সুন্দরবন সংলগ্ন সাধারণ নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ

এই পূজার বিশেষ সক্রিয়। তাদের শ্রদ্ধা ভালবাসায় এই সমস্ত দেব-দেবী আজো সজীব বিজ্ঞান রমারমা থাকা সত্ত্বেও মানুষ তার আধ্যাত্মবিশ্বাস থেকে সরে আসে নি। আসলে মানুষ তার প্রাচীন ধারণা তার সহজাত প্রবণতায়, সে নিজেকে দেবের পায়ে নিবেদিত প্রাণ।

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারা সুদূর ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত। অন্য কোন সাহিত্যধারা এত সুদূর প্রসারী নয়। যাইহোক এই অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি- ‘রায় মঙ্গল’, ‘শীতলামঙ্গল’ এবং ‘ষষ্ঠীমঙ্গল’ সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বরেরা এই কাব্য গুলি রচনা করলেও এদের কাব্যের অতীত খঁজতে গিয়ে প্রধান মঙ্গল কাব্যগুলির প্রায় সমসাময়িক কিন্তু বংশ কৌলিন্য এরা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্যন্ত এদের অতীত ধারাকে বহমান রেখেছে। সমগ্র বাংলা মঙ্গল কাব্যে ‘এদের অপ্রধান হয়ে থাকার কারন কবিদের লেখনী শক্তি অনেকখানি দায়ী। যাই হোক গৌনমঙ্গল কাব্য হিসাবে এদের অবস্থান হলেও আসলে মূল মঙ্গলকাব্য ধারার একটি প্রবাহ। অপ্রধান বা গৌন যে ভাবেই এদের ব্যাখ্যা করা হোকনা কেন আসলে এরা ভীষণ সজীব এদের সজীব হওয়ার প্রধান কারন মানুষ। সমগ্র মানব জাতি এই অতীত চারিতা ও প্রাচীন দেব দেবীর প্রতি তাদের বিশ্বাস আটুট। আর এই আটুট থাকার জন্য তাদের দায়ী শাস্ত্রত কালের। মানুষের সহজাতি প্রবৃত্তি হল দৈব নির্ভরতা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, ধর্মীয় চেতনা তাদের উজ্জীবিত করে। রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং ষষ্ঠীমঙ্গল এই চেতনার বাহিরে নয়। সে কারণে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরা অপ্রধান হলেও সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, মেহনতী মানুষ সর্বপরি নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ জনেরা যুগের ধারার বাহক, আর তাদের আন্তরিক অনুভূতির স্তরে অবস্থান করে এই গৌন দেবদেবীর। সেকারণে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতী মানুষ, নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যতকাল থাকবে, তাদের পূজার্চনা ও জগতে রহমান থাকবে। গবেষক হিসাবে এ প্রত্যাশা আমাদের চিরকালের।

সূত্রনির্দেশ

- ১। 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মডার্নবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
প্রথম প্রকাশ - অশ্বিন- ১৩৭৩
সংশোধিত সপ্তম সংস্কারণ- বৈশাখ ১৩৯২
পৃ. ১২০
- ২। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
এ. মুখার্জী অ্যান্ড প্রাইভেট লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২
পঞ্চম সংস্কারণ- ১৯৭০ (বঙ্গাব্দ-১৩৭৬)
- ৩। তদেব, পৃ. ৭৫৫
- ৪। তদেব, পৃ. ৮২৫
- ৫। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী'; শ্রী সত্যনাথরাম ভট্টাচার্য
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস-৪৮, হাজরা রোড,
কলিকাতা- ৭০০০১৯, প্রথম সংস্কারণ- ১৯৬২
রেজিঃ নং- ২৬২০ বি. পৃ. ক-১৭
- ৬। তদেব, পৃ. ক ১৭
- ৭। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
পৃ. ৮২৫
- ৮। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' ; শ্রী সত্যনাথরাম ভট্টাচার্য
পৃ. ১৬৬
- ৯। তদেব, পৃ. ১৬৭
- ১০। তদেব, পৃ. ১৬৮

- ১১। 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃ. ১২৯
- ১২। 'সুন্দরবন ইতিহাস'; কানাইলাল সরকার
প্রকাশক-রূপকথা প্রকাশন-এর পক্ষে কাবেরী মন্ডল কর্তৃক পিয়ালী, নতুনপাড়া,
রূপকথা লেন, দঃ ২৪ পরগণা। প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ২০১১
পৃ. ১১২
- ১৩। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী' ; শ্রী সত্যনাথারণ ভট্টাচার্য
পৃ. ১৭১
- ১৪। 'বনবিবি পালা'; সুজিত মন্ডল সম্পাদিত
প্রকাশক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্টার অ্যান্ড ভলিউম স্টাডি
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ)
প্রথম প্রকাশ-মার্চ ২০১০, 1ISBN, 81- 86954 - 52-X1
পৃ. ১৩৮
- ১৫। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী' ; শ্রী সত্যনাথারণ ভট্টাচার্য
পৃ. ৬২
- ১৬। তদেব, পৃ. ৬৩
- ১৭। 'সুন্দরবনসেবাল একাল'; অঞ্জলি বিকাশ মন্ডল
প্রকাশক-রূপকথা, প্রচ্ছদ- এক্সপ্লোরার, দুর্গানগর, কলকাতা-৬৫
প্রথম প্রকাশ- ২০১১, পৃ. ৮৮
- ১৮। তদেব, পৃ. ৮৮
- ১৯। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী'; শ্রী সত্যনাথারণ ভট্টাচার্য
পৃ. ১৮০
- ২০। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
পৃ. ৮০৬

- ২১। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী' ; শ্রী সত্যনাথরণ ভট্টাচার্য
পৃ. ৫৬
- ২২। তদেব, পৃ. ক ৫৮
- ২৩। তদেব, পৃ. ক ১৫১
- ২৪। 'মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারীচরিত্র' ; ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পুস্তক বিপানি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
প্রথম প্রকাশ-১লা মার্চ, ১৯৯১, পৃ. ১৮
- ২৫। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী' ; শ্রী সত্যনাথরণ ভট্টাচার্য
পৃ. ১৫১
- ২৬। 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পৃ. ১৩০
- ২৭। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থবলী' ; শ্রী সত্যনাথরণ ভট্টাচার্য
পৃ. ১৫১
- ২৮। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড) ; সুকুমার সেন
প্রকাশক- আনন্দ পবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়া টোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯, ISBN : 81-7215-025-3
পৃ. ৩৮৬
- ২৯। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য
পৃ. ৭৮৯
- ৩০। তদেব, পৃ. ৭৯০
- ৩১। তদেব, পৃ. ৭৯০
- ৩২। 'শীতলা মঙ্গল' ; শ্রীযুক্ত দ্বিজনিত্যানন্দ
শ্রীযুক্ত অভিজিৎ সম্পাদিত, বেণীবাধবশীল লাইব্রেরী, ১৬৭,
ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০১
পৃ.- ৭

৩৩। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' ; শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য

পৃ. ৭৯৪

৩৪। তদেব, পৃ. ৭৯৪

৩৫। তদেব, পৃ. ৮০০

৩৬। তদেব, পৃ. ৮০০

৩৭। 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' ; শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

পৃ. ক ৭৩

৩৮। 'মধ্যযুগের নিম্নবর্গের অবস্থান' ; রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

15BN : 978 - 81-89827-11-3 /

পৃ. ১৩১